International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
Volume-III, Issue-VIII, September 2017, Page No. 11-19
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

সমরেশ বসুর গঙ্গা উপন্যাসে মৎসজীবী সম্প্রদায়

ছালিকুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাথারকান্দি কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত

Abstract

Novel plays a vital role in the field of development of any literature as it brings the social reality to the light. It's a part of literature which acts as a mirror in the society of the society. The living standard of the people, the business policy of a particular section of the society, belief of the people of an area etc. are reflected in a novel. Thus it can be taken as an important part of the literature.

After the independence of India, the people of our country hoped to live a better life. They thought that the sufferings of Indians are over. They could then enjoy their fundamental rights. Moreover the midnight lecture of our first prime minister of free Indian that the long sufferings of Indian under the British are gone and all the problems of the country would be solved wisely, made Indians hopeful that at least they did not need to stand in queue to get their necessary things. But, unfortunately that did not happen in the liver of Indians. Their sufferings remained same. It was just a hand over of monarchism from British to Indians. As a result, many Indians leaders joint communist party. Samaresh Basu was also among them. But he did not continue the party work for a longer time. Rather, he started to wake the Indians up through his writings. The novel 'Ganga' was the outcome of that effort.

"Ganga' written by Samaresh Basu in 1957 an important source to know about the people who lived on the bank of Ganga River vat that time. In this novel the novelist Samaresh Basu has brought the picture of fisherman. Their life-style, belief, business etc. are clearly described in details. The central characters of the novel showed the commoners tried to come out of their debts and live a happy life, but they could not do so due to the pressure of higher section of the society. That is what I would like to discuss in my article.

বিশ শতকের ষাটের দশকে, পাশাপাশি দু'বছরে বেরিয়েছে দু'টি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) এবং সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭)। দুই উপন্যাসের কুশীলব বাঙালি সমাজের প্রান্তবাসী মৎসজীবিরা। বৃত্তের বাইরের মানুষগুলির সমস্যাকে দেখার ও ব্যাখ্যা করার দৃষ্টিভঙ্গি যেমন দুটি উপন্যাসের স্বতন্ত্র, তেমনি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অন্তরালে লেখা দু'টি ও পৃথকভাবে উজ্জ্বল। আপাতত তিতাস-গঙ্গার মানুষগুলি এক নয়, নদী পৃথক, সংঘাতের চেহারাও ভিন্ন। তবু মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস, সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' কিংবা অপর নদী-উপন্যাস সাধনের 'গহিন গাঙ'- এগুলির মধ্যে স্বধর্মের কিছু সূত্র আছে। প্রথমত, সবগুলি রচনাই কোনো না কোনো ভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই ফসল, কেউই অপরিচিত বিষয় নিয়ে রোমান্টিকতার কোন ফানুস তৈরি করেননি। মানিক-অদ্বৈত-সমরেশ-সাধন প্রত্যেকেরই স্বীকারোক্তি একথা সমর্থন করে।

'পদ্মানদীর মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'গঙ্গা'-তিনটি উপন্যাসেরই কালিক প্রেক্ষাপটে রয়েছে বাংলার সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্বসন্ধি। এদেশে ঔপনিবেশিক শক্তির আবির্ভাবের সূত্র ধরে উৎপন্ন হয়েছে ধনতন্ত্রের বীজ, যার অভিঘাতে আমাদের গ্রাম সমাজের ঐতিহ্যগত সম্পর্ক সমূহের ভাঙন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের গ্রাম সমাজকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে সমাজের এই ভাঙনের বিশ্লেষণ রয়েছে। ব্রাহ্মণ ন্যায়রত্নদের হটিয়ে মধ্যমঞ্চে হচ্ছেন নতুন প্রভুশক্তি- ছিরুপাল ওরফে শ্রীহরি ঘোষ, আর কাহার নন্দন করালী হয়ে উঠছে ধনতন্ত্রের শ্রমিক। মানিক-অদ্বৈত-সমরেশ তিনজনেই এই পর্বান্তরকে চিহ্নিত করেছেন নিজেদের মতো করে। প্রথম দুজনের রচনায় মালো ধীবর সমাজের অপ্রতিষ্ঠা, কক্ষ্যচুতি ও প্রভাবই মুখ্য হয়ে উঠেছে, আর সমরেশ বসুর রচনায় পুঁজিবাদী সমাজের অভিঘাতে বিপন্ন মালোদের ভেতর থেকে আধিপত্যবিরোধী প্রতিভাবাদর্শের স্বর বিঘোষিত হয়েছে স্পষ্টভাবে। অন্তেবাসী বর্গের প্রত্যাখ্যানের ভাষাগুলো আমরা বর্গনায়ক বিলাসের চেতনায়, বক্তব্যে বিশ্লেষণে পাই।

সমরেশ বসুর পঞ্চম উপন্যাস 'গঙ্গা', ১৩৬৩ সালের শারদীয় 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একথা সত্য যে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে সমরেশ বসুকে রচনাটা লিখতে হয়েছিল। কোনো তাৎক্ষণিক ভাবনা চিন্তার ফসল এ উপন্যাস নয়। 'গঙ্গা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু লেখকের ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফসল। চরিত্রগুলি তাঁর অতি পরিচিত। যে সমাজের গর্ভ থেকে তাদের জন্ম তার সঙ্গে লেখকের গভীর নৈকট্য। তাদের জীবনের পাঠশালায় তিনি মনোযোগী নিবিড় পাঠক। শুধু কেতাবী পাঠ নেওয়া নয়, ধীবর সমাজের দিনযাপনের প্রাণধারনের প্রাত্যহিকতার সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ ছিল। সেজন্য এই উপন্যাসের উপকরণে ও প্রকরণে এক অদেয় যোগসূত্র সহজেই স্থাপিত হয়।

টমাস হার্ডির আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে এক বিদগ্ধ সমালোচক মন্তব্য করেছিলেনঃ " He digs them up by the roots with earth on them" [১] বাস্তবিকই সমরেশ বসু এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে যেন তাদের সমাজের মাটি খুঁড়ে একেবারে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে এনেছিলেন। 'গঙ্গা' উপন্যাদের ভূমিকায় সে কথা লেখকের স্বীকৃতিতে ধরা পড়েছে: "আর একটি কথা বিশেষভাবেই উল্লেখের প্রয়োজন আছে। উপন্যাসের প্রথম সংস্করনে, যে সব মৎসজীবী বন্ধুদের নিকট আমি আমার ঋণ স্বীকার করেছিলাম, বর্তমান সংস্করণেও তাঁদের নাম উল্লেখ করা উচিত। তাঁরা হলেন, আতপুরের মালোপাড়ার কার্তিক দাস, নরেশ দাস এবং হালিসহরের নিমাই অধিকারী ও তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এঁদের সঙ্গে অনেক দিন ও রাত্রি আমার কেটেছে গঙ্গার বুকে। এঁদের সাহায্য ছাড়া 'গঙ্গা' রচনা সম্ভব ছিল না।" [২] এর ফলে অনিবার্য ভাবেই রচনাটির দু'টি বিশেষত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে- শিল্পির জীবনবোধ ও তথ্য সংগ্রাহকের তথ্যনিষ্ঠা। এই দুই বিশেষত্ব মিলেমিশে 'গঙ্গা' হয়ে উঠেছে একালের একটি শ্রেষ্ট সমাজতাত্ত্বিক উপন্যাস। বাহ্য পরিচয়ে এটি একটি শিল্প সফল উপন্যাস, কিন্তু অন্তর্বৃত্তে এটি মৎসজীবী সম্প্রদায়ের সমাজতাত্ত্বিক জীবনায়ন।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসকে অভিনিবেশ সহকারে খতিয়ে দেখা যেতে পারে, এই লেখা তার কোন কোন বাহু দিয়ে আমাদের টানছে আজও।

গঙ্গার পটভূমি, তার চরিত্রেরা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাঙালি পাঠকের অপরিচিত, এই অপরিচয়ের ফলে একটা আকর্ষণ তো তৈরি হয়ই। অপ্রিচিতের নানা খুঁটিনাটি বিবরণ গঙ্গাকে একটা সারস্বত মর্যাদা দেয়। এর বাইরেও 'গঙ্গা' উপন্যাদের পটভূমি কালজয়ী হবার দুটি জোড়ালো উপাদান আছে বলে আমরা মনে করি। এখানে বর্ণিত সমাজের মানুষেরা অনাগরিক স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত-উৎপাদন সম্পর্কের যে সব পরিবর্তন মানুষ প্রতিবেশী বা সম্পর্ককে পালটে দেয় তার প্রকাশ এখানে বেশ কম। দীর্ঘদিন ধরে একই ধারায় বয়ে যাচ্ছে মাছমারাদের জীবন, এক যুগ থেকে আর এক যুগে তাই তার আবেদন একই রকম।

এই অপরিবর্তনীয়তা এবং প্রকৃতি সংলগ্নতা তৈরি করে জীবনদর্শন। এ লেখার কেন্দ্রে আছে এক নদী আর তার জোয়ার ভাঁটা, বহমানতা বা স্বভাবের অনির্দিষ্টতা দিয়ে জীবনের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। এভাবে প্রাত্যহিকতার একটা ঊর্ধ্বায়ণ ঘটে যায় এই উপন্যাসে, মাছমারাদের দিনযাপনের খুঁটিনাটি প্রসারিত অর্থ পেয়ে যায়। আমরা মনে করি, এ উপন্যাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে উঠেছে মাছ আর মানুষের সম্পর্ক। পাঠক লক্ষ করবেন, মীনচক্ষুর ছবি বার বার ফিরে আসে এখানে। মাছের চোখ ঠাণ্ডা, নিষ্পলক, নিয়তির মত, যে মাছকে মেরে বাঁচে এ উপন্যাসের চরিত্ররা, তাদেরই হাতে মাছদের মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে।

সমরেশ বসু তাঁর 'গঙ্গা' উপন্যাসে লোকজীবনের যে সব উপাদান ব্যবহার করেছেন, যেমন- লোকবিশ্বাস, সংস্কার, লোকজীবনচর্যা, লোকউৎসব ও লোকসঙ্গীত; এসব বৈশিষ্ট্যগুলো প্রধানত লোক ঐতিহ্যের বিচিত্র পরিচয় রূপে এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এখানে সাধারণভাবে লোকসংস্কৃতিকে জনমানসের বৈশিষ্ট্যরূপেই প্রকাশিত হতে দেখা যায় । শিল্পিরূপে সমরেশ বসুর একটাই কৃতিত্ব যে সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনি উপন্যাসের অবয়বের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন, উপন্যাসের পক্ষে ভার হয়ে ওঠেনি এসব তথ্য, বরং উপন্যাসটিকে শিল্পসুষম ঘরের করে তুলেছে। সমষ্টি জীবনের সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনেক সময় প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের (যেমন তেঁতলে বিলাস) আচার আচরণে প্রতিফলিত।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র তেঁতলে বিলাস এর কথাই ধরা যাক। বিলাস একগুঁয়ে সরল প্রকৃতির মানুষ। একগুঁয়েমি তার ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলেও তা একান্তভাবে তাদের জনগোষ্ঠীর জীবন ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ প্রসঙ্গে সমরেশ বসু মালোয়াদের বিশ্বাস সংস্কারের কথাটি সযত্নে উপন্যাসের মধ্যে স্থান দিয়েছেন।

"ওই যে বলে না, ঝালো আর মালো, দুই ভাই। এক মায়ের সন্তান, জন্ম নিলে ভগবানের গলায় মালা থেকে। কে করেছে আর পাঁজিপুঁথির তত্ত্ব-তাল্লাশ। গাঁয়ে ঘরের লোক বলে, শোনে ও গাঁয়ে ঘরের লোক। তাও দুই ভাই-ই, ভগবানের বিধেনে হয়েছে মাছমারা। মা মনসার বৃত্তান্তের মধ্যেও আছে দুই ভাইয়ের কথা।"[৩]

এই জাতিবৃত্তান্তের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মালোদের পতিত হওয়ার কাহিনি গুরুর কথা অমান্য করাই যার মূল কথা। মালো ঘরের ছেলে বিলাস গুরু মানে না, বাপ খুড়ো মানে না। এভাবেই প্রচলিত লোকবিশ্বাসের আদলে নায়কের রূপ ফুটে ওঠে।

উপন্যাসের শুরুতেই আছে নিবারণ মালোর সমুদ্র যাত্রার কথা, শেষ সমুদ্রে যাত্রার কথা এবং অপদেবতা বিষয়ে লোকসংস্কারের উল্লেখ। বিলাসের পর নিবারণ এতবার সমুদ্র মাছ ধরতে গিয়েছিল যে তার নাম হয়ে গিয়েছিল 'সাইদার', আর তার ভাই পাঁচু বিশ্বাস করত যে তার দাদা 'গুনীন' ছিল সে জলের কারসাজি বুঝত, বনের কারসাজিও বুঝত। "টানের মরশুমে দশ-বিশ গণ্ডা জেলে-মালো জুটিয়ে ত্রিশ-চল্লিশটি নৌকা আর পঞ্চাশ-ষাটটি জাল নিয়ে, সে সকলের হয়ে সর্দারি করে দক্ষিণে নিয়ে যেত মাছ ধরতে।"[৪] কিন্তু সেই মানুষও একদিন আর ফিরল না, তার সেই না ফেরার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও এক লোকসংস্কার।

নিবারণ মালোর মুখ দিয়েই সেই লোকসংস্কারের স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। নিবারণ তার ভাইকে শিখিয়েছেঃ "খবোদ্দার, ডাঙ্গার দিকে চোখ ফেরাসনে। ডাঙ্গার তুক বড় তুক।"[৫]

লেখকের বাস্তববোধ অত্যন্ত গভীর ছিল বলেই জেলেদের এই লোকবিশ্বাস, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস 'গঙ্গা' উপন্যাসে এত সহজ, স্বাভাবিক ও অকৃত্রিমরূপে ফুটে উঠতে পেরেছে। কোনো বানিয়ে তোলা কল্পনা সূত্রে তাদের জীবনকাহিনি যদি তিনি গেঁথে তুলতে চাইছেন, তাহলে তা হত অবিশ্বাস্য ও অপরিণত। লেখকের নিজের মুখের বর্ণনা এ প্রসঙ্গে শোনা যাক।

"আমি যখন আতপুরে থাকতাম তখন গঙ্গার ধারে মালোপাড়া বলে যে এলাকাটা ছিল, সেখানে প্রায়ই যেতাম। সেখানে আমার অনেক বন্ধু ছিল। তাদের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা মারা- এসব করতাম। বর্ষার মরশুমে ওরা মাছ ধরত। এইভাবে ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই হালিশগরে কয়েকটি মৎসজীবী পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ওরা চব্বিশ পরগনার পূর্বদিক থেকে এসেছে। আমি ওদের সঙ্গে হাসানাবাদ অঞ্চলে চলে গেলাম এবং পরে আরও দক্ষিণে একেবারে সমুদ্রের দিকে চলে গেলাম। ওদের সঙ্গে থেকে আমার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল।"[৬]

লোকবিশ্বাসের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা যে সর্বসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য এমন কথা বলেননি লেখক, কিন্তু বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে তা অপরিহার্য। তাই জেলেরা যখন মাছ ধরে নদী অথবা সাগরে তাদের বৌ বিনিদ্র রাত জাগে-

" সতর্ক চক্ষু তার জাগে সমুদ্র... দক্ষিণ রায়ের পারে, না বনবিবি আঁচলে জাগে তার চোখ, তার বিনিদ্র আত্মা মাথা কেটে মাছের দেবতা খোকা ঠাকুরের পায়ে। বলে, হে দক্ষিণরায়, তোমার খাড়া নজর দূরে রাখো। মা বনবিবি মাছমারার শাবরে তোমার দৃষ্টি দিওনা। খোকা ঠাকুর, জাল ভরে মাছ দাও।"[৭]

এখানে যে লোকবিশ্বাস যে আর্তি ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে লোকবিশ্বাসের সম্পর্ক সুগভীর। 'গঙ্গা' উপন্যাসে লোক জীবন চর্যার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। লেখক এই প্রবাহমান লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জীবনর্চ্চার রূপচিত্রণে। তা দেখা যায় উপন্যাসটিতে কোনো পরিচ্ছেদ বিভাজন নেই। করা হয়নি কোনো পরিচ্ছেদের নামকরণও। এর কারণটি সমরেশ বসু নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন-

" এরকম কাহিনীকে পরিচ্ছেদে ভাগ করলে এর মানুষগুলিও তাদের জাক এবং নদী সব টুকরো হয়ে যায়।"[৮]

কেবল নদীর ধারার মতো স্বচ্ছন্দ গতিতে কাহিনি এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে। যেখানে নিবারণ, পাঁচু, বিলাস, বশীর, অনন্ত, রসিক, দামিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলো যেমন লোকচরিত্ররূপে গণ্য, তেমনি এদের আচার-আচরণ, জীবন ও জীবিকার সাধারণ পরিচয়ের মধ্যেই লোকজীবনচর্যার উপাদান চিহ্নিত।

মৎসজীবীদের জীবনই রয়েছে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসের কেন্দ্রে। 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'তিতাস একটি নদীর নাম' – এ মানিক ও অদ্বৈত মালো ধীবর জীবনের প্রেক্ষাপটে আর্থিক অবকাঠামো ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোয় পর্বান্তরের যে সূত্রায়ন করেছেন 'গঙ্গা' উপন্যাসে। বাজার নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মালো সমাজের অবস্থা ও অবস্থান চিহ্নিত করেছেন তিনি। জলের উপর সবচেয়ে বেশি শ্রম যাদের, ইলিশের মরশুমে প্রচুর উপার্জনের পরও ক'মাস পেটপুরে খেতে পায় না তারা, নৌকা বাঁধা পড়ে মহাজনের কাছে। নতুন করে মুচলেকা দিয়ে নৌকা ছাড়িয়ে নিতে হয় আষাঢ়ে। অম্বুবাচির পরই ইলিশের খোঁজে নাও ভাসাতে হয় গঙ্গায়। ধলতিতা বীরপুরের মালো। আষাঢ়ে যায় গঙ্গায়, তারপর কার্তিকের 'চকুন্দ-মুকুন্দ' সেরে ঘরে ফেরে। তারপর উত্তরের বাতাসে আসে, সমুদ্র যাত্রার ডাক। অগ্রহায়ণ থেকে চারমাস সমুদ্রে কাটিয়ে 'সাই' ফিরে ঘরে আসে। চৈত্রমাস হলো চোত টোটার সময়- এ সময় জল কমে যাওয়ার চৈত্র মন্বন্তর শুরু হয়। মাছ মেলে না, তখন তারা কাপড় ছাপিয়ে গাজনের সন্ন্যাসী হয়ে ঘোরে। অনেকে কুকাজেও মেতে ওঠে।

এই হলো মালো জীবনের সালতামামি। নামেমাত্র স্বাধীন মৎস্যজীবী, আসলে এরাও মহাজন আর পাইকারদের দাদন খাওয়া শ্রমিক মাত্র। দাদন মানে পুঁজির বিনিয়োগ, তা থেকে ফিরে এসে মহাজনকে কড়ি দেওয়া- বিনিয়োগ করা পুঁজির মুনাফা-ব্যবসার ভাষার 'রিটার্ন' । আর মাঝখানে অভুক্ত শ্রমিক। বাংলার সামন্ত ব্যবস্থায় এভাবেই ক্রমশ পুঁজির এই চাপের মধ্যেও মালোদের চোখে আছে স্বপ্ন, আছে অধীন জীবন থেকে মুক্তি, বড় কিছু করার আকাঙ্ক্ষা। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিলাসের মধ্যে সে আকাঙ্ক্ষারই মুর্ছনা:

> 'আমার প্রাণে সুখ নাই হে
> বড় উথালি পাথালি আমার বুক।"[৯]

সুখিবিহীন আত্মার এই ছটফটানি, উৎপীড়িত চেতনার আর্তনাদ, স্বপ্ন দেখাও স্বপ্নভঙ্গের দ্বন্দ্বে আকীর্ণ 'গঙ্গা' উপন্যাস। [১০] কঠোর বাস্তবতার উপর আধারিত এই উপন্যাসের বিলাসকে যখন রূপকথার নায়ক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন কথাকারের অভিপ্রায়কেই বিকৃত, অবগুণ্ঠিত করা হয়।

এভাবে দুঃখে, কষ্টে আর সংগ্রামে, কলহে আর কোলাহলে জেলেদের জীবন কাটে। দুঃখের বারমাস্যায় কখনও বা সুখের স্পর্শ লাগে। তাই লোকচর্যার বর্ণনায় লোক উৎসবেরও উল্লেখ দেখা যায়। গঙ্গার বুকে যারা মাছ ধরে জীবিকা উপার্জন করে তারা প্রতি বছরেই সাজার উৎসব করে। এই সর্বজনীন গঙ্গাপূজোয় সবাই চাঁদা দেয়- যাকে বলে 'সাজভাটা'। তখন আবার গঙ্গার পাড়ে জেলেদের মেলা বসে যায়।

জাল, মাছ, নৌকা, জীবিকা সংক্রান্ত বহু বিচিত্র তথ্য এই উপন্যাসের কাহিনি কায়ায় মিশে আছে। জাল ফেলতে গিয়ে জলের নীচে জাল বেলিয়ে গিয়ে কেমন করে জেলেদের সর্বনাশ ডেকে আনে, গঙ্গায় যখন মাছ ধরা পড়ে না তখন জেলারা কেমন করে মা গঙ্গার কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে বা নলের টানে প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। অম্বুবাচীর দিনে জাল ফেলা বা মাছ ধরা হয় না, কেননা জেলেরা বিশ্বাস

করে অম্বুবাচীর জলে অনাগত কালের লক্ষণ দেখা যায়, ধরিত্রী মা ঋতুবতী হন। এ বিশ্বাস শুধু গঙ্গার মাছমারাদের নয়, ভারতের মৎসজীবিদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

গঙ্গার বুকে যারা মাছ ধরে তাদের জীবন সংগ্রামের একটি বড় উপদান হল সঙ্গীত। গান গেয়ে তারা মাছ ধরে। গান শক্তি দেয়, আনন্দ আর প্রেরণা দান করে।' গঙ্গা' উপন্যাসেও তাই ফুটে ওঠে লোকসঙ্গীতের ভাষা। বিলাস গান গায়-

> " টানাছাঁদি টেনে চলি, পাথালি লোকের বুক হে
> ওই আওড়ের ঘুর্ণিজলে দেখব তোমার মুখ,
> বড় উথালি পাথালি আমার বুক।"[১১]

-কার মুখ দেখবে বিলাস? কেন উথাল পাথাল করে তার বুক? হিমির জন্যে? যত গান গায় তা শুনলে এসব প্রশ্নই জাগবেই। কিন্তু তা তো আর সমাজতাত্ত্বিক নয়, তাহল উপন্যাসটির শিল্পতত্ত্ব, তার সার্থকতার চাবিকাঠি।

মাছধরা জেলে যারা, তারা শ্রমিক- কঠোর শ্রম দিয়ে নদী থেকে জীবকার রসদ জোগাড় করে। এরা পেটি- বুর্জোয়া শ্রমিক শ্রেণি। এই শ্রমিক শ্রেণিরাই, পাইকার মহাজন, আড়তদার ও চালকদারদের সঙ্গে দরকষাকষিতে হারে। তাদের শ্রম, কিন্তু শ্রমের মুনাফা পায় অন্য মানুষ- যারা শ্রম দেয় না। ফলে এদেশীয় পেট- বুর্জোয়া শ্রমিক অস্তিত্ব সংকটময় হয়ে ওঠে। তবুও এদের পেশা এমন নেশা, সংসার জীবনও যেন নৌকার সঙ্গেই বাঁধা। হিমিকে বিলাস বলে,

> "নৌকার সংসার, যেখানে রোজ বাতি দিতে হবে তিবড়ি জ্বালতে হবে, বসে খেতে হবে। অন্ধকারে একটানা নৌকা ফেলে রাখা যাবে না।"[১২]

সমরেশ বসু মাছমারাদের জীবন কথায় পেশা ও নেশাকে রক্তমাংসে মজ্জার মত সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে ' গঙ্গা; উপন্যাসে এই ভাবে পরীক্ষায় বসেছেন শ্রমিক শ্রেণির মানুষদের নিয়ে।

কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় সমরেশ বসুর নিজের বয়ানেই। গঙ্গানদীকে তিনি নিছক নদী হিসেবে দেখেন না, এক ধরনের রোমান্টিক দার্শনিকতায় আছন্ন লেখকের গঙ্গা, একটি সাক্ষাৎকারে সেকথা বলেছেন সমরেশ বসু:

> "গঙ্গা আমাকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে। সেই কৈশোরকাল থেকেই গঙ্গাকে আমি অন্যভাবে দেখে এসেছি। গঙ্গা আমার আর এক অস্তিত্ব -।"[১৩]

'গঙ্গা' এখানে বস্তুরূপে নয়, এর উপর আরোপ হচ্ছে দার্শনিকতা। দার্শনিকতা মধ্যবিত্ত অবস্থান থেকে, তাই রোমান্টিক। মাছমারাদের সঙ্গে নদীবক্ষে বেড়ানোও তাহলে কি অ্যাডভেঞ্চার ? যেমন বিলাসের হিমি? অ্যাডভেঞ্চারের মায়া / নেশা কাটিয়েই বিলাস শেষপর্যন্ত সমুদ্রে যেতে পারল।

অ্যাডভেঞ্চারই হোক, তবু নদী নালার টপোগ্রাফি, ধীবর জীবনের পারিভাষিক শব্দ তিয়াদি 'গঙ্গা'র ভৌগোলিক বর্ণনাগত বিশ্বাসযোগ্যতা দান করেছে, এতে সন্দেহ নেই। বিশ্বাসযোগ্যতা বর্গজীবনের ছবিতেও লেগেছে। প্রশ্ন হল সমরেশ বসু কি ছবিই আঁকলেন, নাকি মাছমারার চেতনা, ভাবাদর্শের জগৎকেও ধরেছেন, ধরতে পেরেছেন?

মাছমারাদের টোটেম-ট্যাবু-বিশ্বাস- সংস্কারের লোকায়ত সমস্ত অনুপুঙ্খ নিয়ে উপন্যাসে হাজির হয়েছে পাঁচু, যার দৃষ্টিকোণকে লেখক ব্যবহার করেছেন সবচেয়ে বেশি সময়। আর এই বিশ্বাসের জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় বিলাস। এই বেরিয়ে আসতে চাওয়া কি বর্গ থেকে ব্যক্তির দিকে সরে আসা। কৌম বাস্তবতা থেকে অনিকেত আধুনিকতায়, নিজ অভিজ্ঞানে।

আমাদের মনে হয়, বিলাসের ক্রোধ ব্যক্তির দিকে সরে আসা নয়। পাঁচুর চিন্তায়, সংস্কারে যেমন রয়েছে মালো সমাজের দীর্ঘকাল গত লোকায়ত মিথ এর প্রভাব , আছে পেত্নির ধরা, ভূতপ্রেত, তেমনি পাঁজিপুতির অমোঘ বাণীর সূত্রে সে জগতে ঢুকে পড়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবাদর্শ। মালোদের জল অচল হওয়ার রহস্য পাওয়া যাচ্ছে যে লোককথায় সেই গল্প অনুযায়ী মালোর জল অচল হয় ব্রাহ্মণ গুরুর জল সরার ঘটি নিয়ে দেয়নি বলে। এই গল্প কার তৈরি করা? নিঃসন্দেহে তাদের,যারা পাঁজিতে নিদান দেয়, এ বছর ভাগবতী গঙ্গা কত মাছ দেবেন? বিলাস পাঁজিকে অবিশ্বাস করে, কেননা গল্প নির্মাতা, ভাবাদর্শের নিয়ন্তা ব্রাহ্মণ তো আর শুধু পাঁজিই লিখছেন না, যাজন ছেড়ে খাঁটি মহাজন হয়েছেন, হয়েছেন মাছের আড়তদার। পুরোনো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে, আসছে নতুন সম্পর্ক, ব্রাহ্মণ ঠাকুর এখন মন্দিরের পূজারী মাত্র নন, তার সঙ্গে বিলাসের ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্ক। এই বিলাস, শহরের বাজার, তার ছলচাতুরি সবকিছুই চিনেছে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই সে জেনেছে শত্রুকে মিত্রকে, ডিসকোর্স, ভাবাদর্শ কারা তৈরি করে, কেন তৈরি করে? হয়তো আমাদের বিশ্লেষণের ভাষায় নয়, নিজের মত করে। অভিজ্ঞতার শিক্ষাই তো জীবনের বড় শিক্ষা। পাঁচুর মতো সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা হয়ত তার নেই, নেই বড় বিপদের সঙ্গে লড়াইয়ের শিক্ষা, কিন্তু মানুষ সে চিনেছে বেশিই, চিনেছে, জেনেছে সিস্টেমের ফাঁকিটাকেও। তার ডাকাবুকো স্বভাব তাকে মুখর করে তুলেছে। দূর থেকে টর্চ বুলিয়ে যখন ব্যারাকপুরের গঙ্গাবক্ষের ডাকাতধরা প্রহরীদের কাজ শেষ হয়, তখন সেই ফাঁকিটাকেই সে ব্যঙ্গ করে। " হয়ে গেল গো দেখা- ঠাওর করতেই পারলে না, বসে বসে খালি গপ্‌পো করা সার।"[১৪]

এই একই ফাঁকি পাঁজিপুথির ক্ষেত্রেও। পঞ্জিকার কথামতো জলে থাকবে মাছ, বিশ্বাস করে না বিলাস। সে বলে, " পাঁজিপুথির কথা ছাড়ান দেও। ওসব বাজার গরম করা কথা।"[১৫] পাঁচুর যুক্তি তাহলে কি 'মাঙনা মাঙনা' লেখা হচ্ছে? বিলাসের উত্তর , "মাঙানা হবে কেন? মাছের চে'কি পাঁজি বিক্রির কম হয়? - যা আসবে তা আমাদের জালে আসবে পাঁজি লিখলেও আসবে, না লিখলেও আসবে। - কোনও দিন দেখলাম না যে পাঁজি একেবারে অব্যঘ কথা লিখেছে।"[১৬]

বিলাস শ্মশানের সাধুবাবাকে অন্তর্যামী বলে মানে না, বরং উপহাস করে। খনার বচন- টিকটিকির আধিভৌতিক জগতের বিপ্রতীপে দাঁড়ায়ে সে, ঠাকুরের নিষেধ আর ভবিষ্যদ্বাণীর তোয়াক্কা না করে বারংবার সে সমুদ্র যাত্রার দৃঢ় অভিলাস ব্যক্ত করে। প্রশ্ন হলো পাঁজি-খনা টিকটিকির বাইরে আসা বিলাসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক না কি সংস্কারমুক্ত, কমিউনিষ্ট লেখকের আরোপ? যদি বলি আরোপ, তাহলে মানতে হয়, যথাপ্রাপ্ত অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে পাঁচুর স্বগতচিন্তায়ও:

"সংসারের যাবৎ জল, সবই ভগবতীর। এত বিস্তার তুমি কোথায় পারে ভগদ্বতীর জলে মাছ মারবে, তুমি মাছমারা, তার খাজনা নেবে মানুষ। বিল বলো বাওড় বলো, তুমি নিজের হাতে গড়োনি। কিন্তু তার প্রাণী থেকে ঘাস কচুরিপানা, সবকিছুর খবরদারি করবে তুমি। গাঙ-বিল-বাওড়ে যে প্রাণ দেবে আর নেবে,

তার ওপরে তোমার আইন খাটাতে চাও মানুষ হয়ে। খাজনা ধরা, ট্যাকসো ধরো। কিছু ভাত না দিয়ে উমি কিল মারার গোঁসাই। কিসে তোমার হোক? না, তুমি জমা নিয়েছ, দেশের তুমি রাজা হয়েছ।"[১৭]

পাঁচুর সে প্রশ্ন কিসে তোমার হক? থেকে যায় অনুচ্চার, উত্তর প্রজন্ম তাকেই সোচ্চার করে তোলে। সময় আর আর্থিক পরিসরের দ্বিবাচনিকতায়, এভাবেই পাঁচু থেকে বিলাস আলাদা হয়ে যায়, যেমন বনোয়ারি আর করালী । বানোয়ারী-করালি দ্বন্দ্বের ছায়াপাত ঘটেছে পাঁচু- বিলাসের সংঘাতে, একথা বলেও কেউ কেউ বলেছেন এ সংঘাত ব্যক্তিগত, ঐতিহ্য আর ঐতিহ্য ভাঙার সংঘাত নয়। কেন নয়? পাঁচু-বিলাসের সংঘাত তো ভাবাদর্শের সংঘাত। পাঁচুতে প্রতিষ্ঠান আনুগত্য, বিলাসে প্রত্যাখ্যানের প্রয়াস।

বিলাসের সমুদ্র যাত্রার নানান রকমের দার্শনিক ব্যাখ্যা হয়েছে। জনৈক সমালোচকের কাছে এ উপন্যাস ছেলেদের কাহিনিই নয়, এক মহাযাত্রার কাহিনি। নিঃসন্দেহে রোমান্টিক মহাযাত্রার কথাই বলছেন তিনি। এমন নিরন্তর প্রবহমানতায় নিজের বিশ্বাসেরকথা বলেছেন। লেখকও বলেছেন তিনিও সেই প্রবাহমান স্রোতের যাত্রী। যথার্থই বলেছেন একজন প্রাবন্ধিক, এ হলো সমরেশ বসুর পাঠকসত্তার প্রতিক্রিয়া, প্রথম প্রকাশের ১৭ বছরের পর। আমরা বলি, এ প্রতিক্রিয়া মধ্যবিত্ত স্বভাবের, বাস্তবকে সংকেতে নিয়ে যাওয়া তার স্বভাব বৈকি। বিলাসের পক্ষ থেকে সমুদ্র যেতে চাওয়ার অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। সে নিবারণ সাইদারের ছেলে, রক্তে তার সমুদ্রের নেশা, বাপের মতোই সে গোঁইয়ার, নিবারণও যাত্রাপত্রে কচ্ছপ দেখে বলেছিল, এরজন্য যাওয়া আটকাতে পারে না। 'বাঁপের মতো' দেখতে বিলাস , সেই মতো গোঁয়ার। সে জানে একবার সমুদ্র যেতে পারলে মহাজনের ঋণ থেকে মুক্তি পেলেও পেতে পারে। অধীন, নিগৃহীত, ঋণগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি তো সমস্ত আকর্ষণ থেকে বড়। এই মুক্তির টানেই তো হিমির টানও ছাড়ান যায়। হিমির সান্নিধ্যে বিলাসের ব্যক্তিত্ব রচনার ক্ষেত্রে লেখকের ভাবদর্শ রঙ চড়িয়েছে বিলাসের গায়ে, তাই এখানে বিলাসের কথাবার্তাও কৃত্রিম ঠেকে। তথাপি, বিলাসের ক্রোধ, বিলাসের প্রতিক্রিয়া, বিলাসের স্বপ্নে নিম্নবর্গেরই দ্রোহচেতনা, মর্যদা অর্জনাকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগত নয়, বর্গগত, বিলাস, করালীরই মত নতুন প্রজন্মের বর্গনায়ক, করালীরই মত সেও অর্থনীতির একটা রূপান্তরের পর্বে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রান্তিকালে অস্থিরতা স্বপ্ন, এতদিনকার অধীনতার অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার কালাপাহাড়ি উগ্রতা, করালীর মত তার মধ্যেও। তাই বলে সে বর্গসংস্কৃতিচ্যুত হয়নি। শুধু তার কৌমচেতনার উপর থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী আচ্ছাদনটাকে সরিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে। উপন্যাসের শেষেও দেখি, সে সাগরে গেছে, তবে একা নয়, কৌমদলপতি হয়েই, আঠারো গন্ডা নৌকা শাবর করেছে রাইমঙ্গলের মোহনায়। এ যাত্রা অনির্দেশ্য মহাযাত্রা নয়, মাছমারার সাগরে যাওয়া, বড় নির্দিষ্ট ভৌগোলিক চিহ্নে, লেখক কি তা স্পষ্ট করেননি?

বর্গ থেকে ব্যক্তির দিকে গেছে বিলাস- এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে, সুতরাং আমরা একমত হতে পারি না। গঙ্গার বিলাস যথার্থ অর্থেই বর্গনায়ক, তার মধ্যে দিয়ে শ্রেণি বর্গ লাঞ্ছিত সমাজের অন্তবাসীবর্গের নিজস্ব উচ্চারণ, প্রতিভাবাদর্শের স্বর নৈঃশব্দের চক্রান্ত পেরিয়ে স্পষ্ট শ্রুত হয়েছে। এই প্রতিভাবাদর্শের দর্পণে যথার্থভাবেই বিম্বিত হয়েছে, অধিপতিবর্গের আর্থিক ও নৈতিক জগৎ - যা প্রতিষ্ঠিত মিথ্যার উপর, শোষণের উপর, পাপের উপর। নির্বিকল্প প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বিলাস সাগর থেকে ফিরে কি রেহাই পাবে তার জীবনের জ্বালা, অধীনতার গ্লানি থেকে? নিশ্চয়ই না, তবু এই দাঁড়ানোতেই সে অনন্য, মধ্যবিত্তের আপসকামিতার বিপরীত এই বলিষ্ঠতার জন্যই বিলাস, করালিকে মনে করিয়ে দেয়। যদিও পাঠক জানেন,

যে পাঠক সমাজবিদ্যার ছাত্র, বিলাসের পরিণতি করালীর মতই স্বপ্নভঙ্গের ইশারায় শেষ হবে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের এই হলো বাস্তবতা।

তথ্যসূত্র:

১. কথা সাহিত্যে সমরেশ বসু; সামগ্রিক মূল্যায়ন; অঞ্জলী প্রকাশনী, কলকাতা; ২০০৬; ড. ঝুমা রায় চৌধুরী পৃ. ১৯২
২. সমরেশ বসু রচনাবলী; (Vol-1) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা); আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা; ২০০১ পৃ. ৮৭৬
৩. .....ঐ..... পৃ-২১৬
৪. লেখকের মুখোমুখি- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ. ২১৪
৫. সমরেশ বসু রচনাবলী (vol-1) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা); আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা; ২০০১ পৃ. ২২০
৬. 'গঙ্গা' ১৯৭৮ এর ভূমিকা; সমরেশ বসু
৭. সমরেশ বসু রচনাবলী (vol-1) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা); আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা; ২০০১ পৃ. ২২০
৮. সমরেশ বসুর কথার জগৎ - নরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত – পৃ. ৩১৩
৯. সমরেশ বসু রচনাবলী (vol-1) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা); আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা; ২০০১ পৃ. ২২৪
১০. .....ঐ..... পৃ. ২২৪
১১. প্রাক 'বিবির' পর্বে সমরেশ বসু; সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা- ১৯৯৬ ড. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ.১৩১
১২. সমরেশ বসু রচনাবলী (vol-1) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা); আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা; ২০০১ পৃ. ২৩৭
১৩. .....ঐ..... পৃ. ২১৬
১৪. .....ঐ..... পৃ. ২১৭
১৫. .....ঐ..... পৃ. ২৩০
১৬. সমরেশ বসু: সময়ের চিহ্ন: পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়; র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা; ১৯৯৭ পৃ. ৫৭
১৭। 'গঙ্গা'- ১৯৭৪ এর ভূমিকা- সমরেশ বসু।